ইসলামি জাগরণ
অবহেলা ও বাড়াবাড়ি

ড. ইউসুফ আল কারজাভি (রহ.)
ভাষান্তর : ফরহাদ খান নাঈম

গার্ডিয়ান
পাবলিকেশনস

ভূমিকা

১৯৮১ খ্রিষ্টাব্দ মোতাবেক ১৪০১ হিজরির রমজান ও শাওয়াল মাসে *আল উম্মাহ* নামক একটি সাময়িকী আমার লিখিত দুটি নিবন্ধ ছাপে। সেখানে মুসলিম যুবকদের জেগে ওঠা নিয়ে আলোচনা করেছিলাম। আমি বলেছি, আমাদের যুবকদের প্রতি স্নেহশীল হতে হবে। কোমল আচরণের মাধ্যমে কথা বলতে হবে তাদের সঙ্গে। এতে তাদের জেগে ওঠা ইসলামের পক্ষে কাজে লাগানো সম্ভব হবে।

আমার এই নিবন্ধটি গোটা মুসলিম বিশ্ব সাদরে বরণ করে নেয়। বহু ভাষায় এর অনুবাদও প্রকাশিত হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের বহু ছাত্র-ছাত্রী সাগ্রহে এটি অধ্যয়ন করে। অথচ এতে আমি তাদের সমালোচনাই করেছি!

কায়রো বিশ্ববিদ্যালয়ের একদল মুসলিম যুবক ১৯৮১ সালে একটি গ্রীষ্মকালীন ক্যাম্পিংয়ের আয়োজন করে। সেখানে তারা আমার এই গবেষণাকর্মটি নিজ উদ্যোগে ছাপিয়ে আগ্রহী ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে বিতরণ করে। এ থেকে বোঝা যায়, আমাদের যুবকদের মধ্যমপন্থার প্রতি ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি রয়েছে।

সম্প্রতি কিছু মুসলিম দেশের শাসকদের সঙ্গে যুবকদের রেষারেষি চলছে। এ নিয়ে আমি এখানে আলোচনা করতে চাই না। কারণ, বিবদমান পরিস্থিতি আরও উসকে দেওয়া আমার উদ্দেশ্য নয়।

বর্তমান পরিস্থিতিতে ধর্মীয় চরমপন্থা এত চরমে পৌঁছেছে যে, শুধু জ্ঞানী ব্যক্তিরাই বাড়াবাড়ি করছে না; বরং যাদের জানাশোনার পরিধি খুবই সীমিত, ইসলামের প্রতি যাদের বিদ্বেষ ভাব সুস্পষ্ট, তারাও এই বাড়াবাড়িতে যোগ দিয়েছে।

একই বিষয়ে লেখার জন্য কয়েক বছর আগে *আল আরাবি* ম্যাগাজিনও বলেছিল আমাকে। ১৯৮২ সালের জানুয়ারি সংখ্যায় তারাও আমার লেখা এ বিষয়ক একটি নিবন্ধ ছাপল। তখন কিছু বন্ধু আমার ভুল ধরে বলল—'আপনি এমন একটি বিষয়ের অবতারণা করেছেন, যেটাতে সত্য বিকৃত হয়েছে।' কারণ, তারা হয়তো বুঝতে পারেনি, এসবের পেছনে মূল উদ্দেশ্য ছিল ধর্মীয় চরমপন্থার বিরোধিতা করা। তারা বুঝতে পারেনি, আমাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে—চরমপন্থা নির্মূল করে চরমপন্থিদের মধ্যমপন্থি বানানো। তবে তারা অবশ্য আমার লেখার ধরন নিয়ে কোনো প্রশ্ন তোলেনি।

তারা ভেবেছিল, আমরা ইসলামি জাগরণের পথ বরং রুদ্ধ করে দিচ্ছি। তাদের দৃষ্টিতে মুসলিম বিশ্বের স্বৈরশাসকেরা ঠিক ছিল। তাদের মতে, শাসকগোষ্ঠী তো আর এমনি এমনি ধর্মীয় বিষয়ে হাত দেয়নি; বাড়াবাড়িটা প্রথমে যুবকরাই শুরু করেছে। আমার এই বন্ধুরা মূলত শাসকগোষ্ঠীর রগ ধরতে ব্যর্থ হয়েছিল। তারা দেখেছিল, শাসকগোষ্ঠীর সমর্থনে দেশের শীর্ষস্থানীয় বহু আলিম রয়েছেন। কিন্তু তারা জানত না, এই আলিমসমাজকে শাসকরা নিজেদের স্বার্থে ব্যবহার করছে।

স্বার্থ যখন ফুরিয়ে যাবে, তখন তাদের ছুড়ে ফেলতে সময় লাগবে না। উদ্ভূত সমস্যার মূলে যে ধর্মীয় চরমপন্থা কাজ করছে, এ ব্যাপারে তাদের ধারণা ছিল না। 'ইসলামি শাসনাধীন' কোনো দেশে ভিন্ন কোনো ইসলামি আন্দোলন শুরু হওয়াকে তারা নেতিবাচক দৃষ্টিতে দেখত।

শাসকগোষ্ঠী ডানপন্থি-বামপন্থি বিভিন্ন চরমপন্থিদের সঙ্গে হাত মিলিয়েছে বটে; কিন্তু কখনোই ইসলামি কোনো আন্দোলনের সঙ্গে আপস করেনি। বরং মাঝে মাঝে এই ইসলামি আন্দোলনকে নিজেদের স্বার্থে কাজে লাগিয়ে আবার ফেলে দিয়েছে। ফলে মুসলিম দেশের তথাকথিত ইসলামি শাসকদের সঙ্গে বহির্বিশ্বের ইসলামি শত্রুরা আঁতাঁত গড়ে তোলা শুরু করেছে। আল্লাহ তায়ালা বলেন—

وَاِنَّ الظّٰلِمِيْنَ بَعْضُهُمْ اَوْلِيَآءُ بَعْضٍ ۚ وَاللّٰهُ وَلِيُّ الْمُتَّقِيْنَ-

'নিশ্চয় জালিমরা মূলত একে অপরের বন্ধু আর আল্লাহ মুত্তাকিদের বন্ধু।'[১]

সম্প্রতি ঘটে যাওয়া ঘটনাগুলো কুরআনের এই আয়াতের প্রমাণ বহন করে। মিশরে ইসলামি পুনর্জাগরণের নিমিত্ত যেসব ইসলামি দল কাজ করত, তাদের সবগুলোকে চরমপন্থি আখ্যা দেওয়া হয়েছে। প্রথমে তারা চরমপন্থার দিকে এগোলেও পরবর্তী সময়ে ইসলামি চিন্তাবিদ ও উলামায়ে কেরামগণ তাদের বুঝিয়ে মধ্যমপন্থার দিকে ধাবিত করা শুরু করেছেন। কিন্তু অবাক করা বিষয় হলো, যুবকরা চরমপন্থা ছেড়ে মধ্যমপন্থার দিকে হাঁটা শুরু করলেও তথাকথিত ইসলামি শাসকগোষ্ঠী কিন্তু চরমপন্থা ত্যাগ করেনি; বরং চরমপন্থি বিভিন্ন দলকে প্রশ্রয় দিয়ে মধ্যমপন্থাকে নিশ্চিহ্ন করার স্কিম গ্রহণ করেছে।

এই সবকিছু মাথায় রেখে আমি *আল আরাবি*তে আমার নিবন্ধ লেখা শুরু করি। শুরুতেই আমি বলেছি—'আমি মনে করি, ধর্মীয় চরমপন্থা একটি সমস্যা এবং এ সমস্যা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা উচিত। সম্প্রতি চরমপন্থার প্রভাব অত্যন্ত ভয়াবহ আকার ধারণ করছে। তবে প্রথমে এ বিষয় নিয়ে লিখতে কিছুটা দ্বিধাদ্বন্দ্বে ছিলাম। কারণ, আমার ভয় হচ্ছিল, হয়তো-বা অনেকেই আমার লেখার ভুল ব্যাখ্যা করবেন। অথবা কোনো কুচক্রী মহল আমার মূল উদ্দেশ্যকে এড়িয়ে গিয়ে আমার এই লেখাকে আমার এবং এই ম্যাগাজিনের বিরুদ্ধে ব্যবহার করবে।'

ধর্মীয় চরমপন্থা এখন একটি পরিভাষায় রূপ নিয়েছে। অনেকেই নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য তাদের বিরোধী দলকে 'চরমপন্থি' আখ্যা দিয়ে ফেলে। তবে আমি সত্যাসত্য যাচাই না করে সংখ্যাধিক্যের সমর্থন করি না। যদিও আমি দেখতে পাচ্ছি, শাসকগোষ্ঠীরা সংখ্যাধিক্যের দিক থেকে তাদের বিরোধী দলের তুলনায় শক্তিশালী অবস্থানে আছে। শাসকমহলের শক্তির অপপ্রয়োগের ফলে আজকাল সত্যিকারের মুসলমানেরাও নিজেদের পক্ষে কথা বলতে পারছে না। গণমাধ্যমে মতপ্রকাশের কোনো স্বাধীনতা নেই। মসজিদের মিম্বরগুলোতে খতিবগণ স্বাধীনভাবে বক্তব্য রাখতে পারছেন না।

যুগ যুগ ধরে উলামায়ে কেরাম ইসলাম বিদ্বেষীদের পক্ষ থেকে বিভিন্ন অভিযোগ বরণ করে আসছেন। সেকেলে, অনাধুনিক, গোঁড়া, অতি সংবেদনশীল, দালাল ইত্যাদি বিভিন্ন অভিযোগে

[১] সূরা জাসিয়া : ১৯

জর্জরিত উলামায়ে কেরাম। পূর্ব-পশ্চিম, ডান-বাম সকল শ্রেণির ইসলামবিদ্বেষী উলামায়ে কেরামের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হয়ে ইসলামি জাগরণের পথ চিরতরে যুদ্ধ করে দিতে চাইছে।

অনেক চিন্তা করার পর দেখলাম, চরমপন্থার এই সমস্যাটি এখন আর নির্দিষ্ট কোনো দেশের গণ্ডিতে সীমাবদ্ধ নয়; বরং তা মুসলমানদের জন্য একটি বৈশ্বিক সমস্যায় পরিণত হয়েছে। এই সমস্যার বিরুদ্ধে যদি আওয়াজ তোলা না হয়, তাহলে তা হবে রণে ভঙ্গ দেওয়ার মতোই অপরাধ। এজন্যই আল্লাহর ওপর ভরসা করে সত্যকে সবার সামনে তুলে ধরার নিয়তে আমি এ কাজে হাত দিয়েছি। আল্লাহর রাসূল (সা.) বলেছেন—'প্রত্যেক আমলই নিয়তের ওপর নির্ভর করে। আর সবাই তার নিয়ত অনুযায়ী পুরস্কৃত হবে।'

ইতোমধ্যে একাধিক লেখক এ বিষয়ে কলম ধরেছেন, যদিও তাদের সবাই সমানভাবে এ বিষয়ে দক্ষ ও অভিজ্ঞ নয়। এজন্য এখন সময় এসেছে, দক্ষ ও যোগ্য উলামায়ে কেরাম এ বিষয়টি উম্মতের সামনে স্পষ্টভাবে তুলে ধরবেন।

তা ছাড়া ধর্মীয় চরমপন্থা নিয়ে আমি বহুদিন থেকে এমন একটি কাজ করতে চেয়েছিলাম। কয়েক বছর আগে *আল মুসলিম আল মুয়াসির* সাময়িকীতে আমার লেখা একটি প্রবন্ধ ছাপা হয়েছিল। এর বিষয়বস্তু ছিল 'তাকফিরের আতিশয্য এবং এর স্বরূপ'। এরপর এই গত কয়েক মাস আগে 'মুসলিম যুবকদের পুনর্জাগরণ' শীর্ষক আরেকটি প্রবন্ধ ছাপা হয় *আল উম্মাহ* ম্যাগাজিনে। এ পর্যন্ত বহু মুসলিম যুবকের সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হয়েছে। বিভিন্ন সভা-সেমিনারে মধ্যমপন্থার প্রয়োজনীয়তা ও চরমপন্থার ভয়াবহতা নিয়ে তাদের সঙ্গে আলোচনা করার সুযোগ হয়েছে আমার। *আল উম্মাহ* ম্যাগাজিনে প্রকাশিত প্রবন্ধটিতে আমি মনের সাধ মিটিয়ে আলোচনা করতে পারিনি। কারণ, তার কলেবর ছিল সীমিত।

এজন্য আমার মনে হলো, এ বিষয়টি নিয়ে আরও বিস্তারিত ভাবা প্রয়োজন। ধর্মীয় চরমপন্থা সৃষ্টি হচ্ছে কেন? এর গোড়া আসলে কোথায়? এর প্রতিকার কী? এসব নিয়ে সঠিক ইসলামি দৃষ্টিকোণ থেকে বিস্তারিত আলোচনা হওয়া জরুরি। আমার কাছের ও দূরের মানুষ এ কাজে আমার যতই বিরোধিতা করুক না কেন, আমি এতে ভগ্নোদ্যম হব না, ইনশাআল্লাহ।

আল্লাহর রাসূল (সা.) বলেছেন—'মধ্যমপন্থিদের মাধ্যমেই ইসলামের পতাকা এক প্রজন্ম থেকে আরেক প্রজন্মের কাছে হস্তান্তরিত হবে। তাদের কাজ হবে ধর্মকে বিকৃতি, গোঁড়ামি, মিথ্যাচার ও ভুল ব্যাখ্যা থেকে রক্ষা করা।' এ হাদিস থেকে বোঝা যায়, রাসূল (সা.) সত্যকে সবার সামনে তুলে ধরার দায়িত্ব উলামায়ে কেরামকে দিয়েছেন। তবে ইসলামের প্রকৃত খয়ের খাঁ যারা আছেন, তারাও অভিজ্ঞতা থাকা সাপেক্ষে এ বিষয়ে আলোকপাত করতে পারেন।

যুবকদের বাড়াবাড়ির জন্য শুধু তাদেরই দায়ী করা অনুচিত। কিছু অত্যুৎসাহী যুবকের পাশাপাশি এ রকম বহু দল-উপদল রয়েছে, যারা সঠিক ইসলামি শিক্ষাকে না বোঝার কারণে কিংবা অবহেলা করার কারণে বিভিন্নভাবে ধর্মীয় চরমপন্থার জন্ম দিয়ে যাচ্ছে। যদিও তারা নিজেদের নির্দোষ দাবি করে। আধুনিকবাদী পিতা-মাতা, শিক্ষক, পণ্ডিত ও নামধারী কিছু মুসলমান প্রকৃত ইসলামপন্থিদের মুসলিম ভূখণ্ডেই বিভিন্নভাবে লাঞ্ছিত করছে।

আমরা আমাদের দু-চোখ দিয়ে শুধু যুবকদের বাড়াবাড়িই দেখি। অথচ বাড়াবাড়ি বা চরমপন্থা সৃষ্টিতে আমাদেরও যে জোর ভূমিকা রয়েছে, তা আমরা দেখতে রাজি নই। আমরা যুবকদের

সহিষ্ণুতা, ধৈর্য ও হিকমত অবলম্বনের উপদেশ দিই। তাদের চরমপন্থা ও বাড়াবাড়ি থেকে বেরিয়ে আসতে বলি। কিন্তু কখনোই প্রাপ্তবয়স্কদের দেখি না—তারা নিজেদের দ্বিমুখিতা, ভণ্ডামি ও স্ববিরোধী আচরণ শোধরানোর চেষ্টা করছেন। আমাদের সব দাবি-দাওয়া যুবকদের কাছে; কিন্তু নিজেরা যা প্রচার করি, তা আমল করার ধার ধারি না। ব্যাপারটি এমন, কেমন যেন আমাদের কোনো দায়দায়িত্ব নেই; যত কর্তব্য শুধু যুবকদের।

স্বীকার করে নিতে হবে, আমাদের ভুলের কারণেই যুবকরা চরমপন্থার পথ বেছে নিয়েছে কিংবা বেছে নিতে বাধ্য হয়েছে। আমরা নিজেদের মুসলমান বলে দাবি করি; কিন্তু ইসলামের কোনো শিক্ষাই অনুসরণ করি না। কুরআন তিলাওয়াত করি; কিন্তু কুরআনের শিক্ষা গ্রহণ করি না। নবিজির আশেক বলে দাবি করি; কিন্তু আমাদের কথা ও কাজে তাঁর সুন্নত নেই। আমরা সগর্বে ঘোষণা করি, ইসলাম আমাদের রাষ্ট্রীয় ধর্ম; কিন্তু রাষ্ট্র পরিচালনায় কখনো ইসলামকে কাজে লাগাই না।

আমাদের এই দ্বিচারিতা ও অসংগতি যুবকদেরকে আমাদেরই বিরুদ্ধে প্রভাবিত করেছে। ফলে তারা আমাদের ছাড়াই ইসলাম নিজেদের মতো করে বুঝেছে। তারা দেখেছে, তাদের পিতা-মাতা তাদের নিরুৎসাহিত করছে, তাদের শিক্ষকগণ তাদের প্রতি উদাসীন, মুসলিম দেশের শাসকগণ ইসলামের প্রতি শত্রুভাবাপন্ন এবং সমাজের পণ্ডিত ব্যক্তিগণ কঠোর।

এজন্য যুবকদের শান্ত হতে বলার আগে, তাদের সহিষ্ণুতার সবক দেওয়ার আগে প্রথমে নিজেদের সংস্কার করতে হবে। কুরআনের বিধান মোতাবেক সমাজ পরিচালনার গুরুদায়িত্ব গ্রহণ করতে হবে।

এখানে একটি বিষয় বলতেই হবে। অনেকে মনে করেন, সমাজ থেকে চরমপন্থা নির্মূল করার দায়িত্ব শুধু ইসলামি শাসকদের। যুবকদের চরমপন্থা থেকে সরিয়ে এনে ইসলামের সঠিক পথে নিয়ে আসার দায়িত্ব মুসলিম রাষ্ট্রের। চরমপন্থা ও বাড়াবাড়িকেন্দ্রিক যা কিছু ঘটেছে ও ঘটছে, এর জন্য দায়ী মূলত রাষ্ট্রযন্ত্র।

আমরা স্বীকার করি, সমাজ ও রাষ্ট্র থেকে যাবতীয় অসংগতি দূর করার মূল দায়িত্ব সরকারের। কিন্তু তারা তাদের এই গুরুদায়িত্ব পালনে অক্ষম। কেননা সরকারমহলের বিভিন্ন রুই-কাতলা তাদের স্ব-স্ব রাজনৈতিক স্বার্থসিদ্ধির জন্য রাষ্ট্রযন্ত্রকে ব্যবহার করছে। মুসলিম দেশের সরকারের পক্ষে যুবকদের সঠিক দিকনির্দেশনা দিয়ে ইসলামের পথে নিয়ে আসা তখনই সম্ভব হতো, যদি সরকারব্যবস্থা ক্ষমতাসীন লোকদের কালো থাবা থেকে মুক্ত থাকত। এজন্য ক্ষমতাহীন সরকারব্যবস্থা বর্তমানে প্রাণহীন কঙ্কালের ভূমিকা পালন করছে।

আমাদের আরও বিশ্বাস করতে হবে, যাদের উপদেশ দেওয়া হয়, তাদের প্রতি যদি আস্থা না থাকে, তাহলে সেই উপদেশ অর্থহীন। আস্থা ও আত্মবিশ্বাসহীন উপদেশবাণী নিছক বাগ্মিতা।

মুসলিম দেশের সরকারব্যবস্থা ও সরকার কর্তৃক নিযুক্ত তথাকথিত আলিমদের ওপর থেকে যুবকদের আস্থা হারিয়ে গেছে। সাম্প্রতিককালে ঘটে যাওয়া বহু ঘটনা ও ঘটনাপরবর্তী পরিস্থিতি অবলোকন করে মুসলিম যুবকদের কাছে এ কথা পরিষ্কার হয়ে গেছে যে, সরকারের কাছে ইসলামি শিক্ষা মূল্যহীন। তারা এখন নিজ নিজ সাম্রাজ্য গড়তে ব্যস্ত।

সরকার যদি ইসলামের পক্ষে কথা বলত, তবেই এটি যুবকদের নিজের পক্ষে প্রভাবিত করতে পারত। সরকার কর্তৃক নিযুক্ত আলিমগণের উচিত ছিল রাজনীতির পরিবর্তনশীল গণ্ডিতে প্রবেশ না করে রাষ্ট্রীয় উদ্যোগে কিছু জ্ঞানীগুণী মুসলিম তৈরি করা, যারা শুধু ইসলাম সম্পর্কে জানবেই না, সাথে সাথে সামসময়িক সমস্যাগুলো ইসলামের আলোকে সমাধান করার পদ্ধতিও বুঝবে। তাদের বৈশিষ্ট্য হওয়ার উচিত ছিল কুরআনের এই আয়াতে বর্ণিত বৈশিষ্ট্যের মতো—'যারা আল্লাহর বাণী পৌঁছিয়ে দেয় ও তাঁকে ভয় করে এবং আল্লাহ ছাড়া কাউকে ভয় করে না।'[২]

বর্তমানে আমাদের সমাজে এই ধরনের কিছু পণ্ডিত ব্যক্তি দরকার। যাদের থাকবে গভীর অন্তর্দৃষ্টি এবং যুবকদের অনুপ্রাণিত করার অসাধারণ ক্ষমতা। তারা যুবকদের ঈমানি শক্তিকে ইসলামি জাগরণের আন্দোলনের সঙ্গে জুড়ে দেবেন। যারা দূরে দূরে থাকে, ইসলামি জাগরণের প্রতি যারা উদাসীন, যারা ইসলাম প্রতিষ্ঠার পথে সৃষ্ট বাধা মোকাবিলার কোনো ক্ষমতা রাখে না, যারা শুধু সমালোচনাই করতে জানে, তাদের পক্ষে আর যা-ই হোক, যুবকদের সঠিক পথের দিশা দেওয়া সম্ভব নয়। কথায় আছে 'কষ্ট ছাড়া কেষ্ট মেলে না।'

যারা ইসলামের জন্য নিজেদের জীবন উৎসর্গ করতে জানে না, ইসলাম প্রতিষ্ঠার পথে সৃষ্ট বাধা মোকাবিলা করার মানসিকতা যাদের নেই, সমস্যায় জর্জরিত মুসলিম উম্মাহ যাদের ভাবনার জগতে দোলা দেয় না, তারা আত্মকেন্দ্রিক। এ সমস্ত আত্মকেন্দ্রিক মানুষের মুখে ধর্মের কথা মানায় না, পরিবর্তনের কথা তাদের মুখে শোভা পায় না। যদি জোর করে তারা ধর্মের কথা বলেও, কেউ তাদের কথা শোনে না।

পরিশেষে আমি বলব, যারা মুসলিম যুবকদের উপদেশ দেওয়ার মহান দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন, তাদের মহল থেকে বেরিয়ে জমিনে আসতে হবে। তাদের বুদ্ধিবৃত্তিক পরিমণ্ডল থেকে বেরিয়ে বোঝার চেষ্টা করতে হবে যুবকদের মানসিকতা। যুবকদের প্রত্যাশার বিশালতা বুঝে তাদের উষ্ণ আলিঙ্গনে সিক্ত করতে হবে। তাদের আন্তরিকতা, সংকল্প, সৎ উদ্দেশ্য ও কর্মকে মূল্যায়ন করতে হবে। যুবকদের কথা ও কাজে শুধু নেতিবাচকতা খুঁজলে চলবে না। তাদের মধ্যে অবশ্যই অনেক ইতিবাচক গুণাগুণ রয়েছে, সেগুলো আবিষ্কার করতে জানতে হবে। তাদের ব্যাপারে কোনো সিদ্ধান্ত দিতে গেলে কিংবা তাদের পক্ষে-বিপক্ষে কথা বলতে গেলে অবশ্যই সার্বিক পরিস্থিতি বিবেচনা করতে হবে।

আল্লাহ তায়ালা আমাদের সবাইকে বাড়াবাড়ি ও চরমপন্থা থেকে হেফাজত করুন এবং সিরাতে মুস্তাকিমের পথে পরিচালিত করুন, আমিন!

---

[২] সূরা আহজাব : ৩৯

সূচিপত্র

বাড়াবাড়ি : অভিযোগ ও বাস্তবতা	**১৭**
◈ মধ্যমপন্থার আহ্বান এবং চরমপন্থার বিরুদ্ধে সতর্কবাণী	২৭
◈ ধর্মীয় চরমপন্থার বিচ্যুতি এবং এর ভয়ানক পরিণতি	২২
◈ ধর্মীয় চরমপন্থার ধারণা এবং মূলভিত্তি	২৫
◈ দুটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়	২৬
◈ চরমপন্থার বহিঃপ্রকাশ	৩০
◈ অনাবশ্যক বিষয় জনসাধারণের ওপর চাপানো	৩১
◈ উসকানিমূলক কঠোরতা	৩৩
◈ অনমনীয়তা ও রূঢ়তা	৩৫
◈ অন্যদের খারাপ মনে করা	৪১
◈ তাকফিরের হুকুমে পতিত হওয়া	৪৪
চরমপন্থার কারণ	**৪৮**
◈ চরমপন্থার কারণ ও উদ্দেশ্য	৪৮
◈ চরমপন্থার কারণ সম্পর্কে সার্বিক পর্যবেক্ষণ	৪৮
◈ দ্বীনের প্রকৃত অর্থ বুঝতেই অন্তর্দৃষ্টি না থাকা	৪৯
◈ কুরআন-সুন্নাহ বোঝার ক্ষেত্রে অক্ষরবাদের প্রবণতা	৫১
◈ ছোটোখাটো বিষয় নিয়ে পড়ে থাকা	৫৬
◈ অতিরিক্ত নিষেধাজ্ঞা	৫৮
◈ ভুল ধারণা	৬১
◈ রূপক ব্যাখ্যা নিয়ে মাতামাতি	৭০
◈ অজ্ঞদের কাছে জিজ্ঞেস করা	৭৫
◈ মুসলিম যুবকরা যে কারণে আলিমদের থেকে দূরে	৭৬
◈ আল্লাহর নেজাম বোঝার ব্যর্থতা	৮৩
◈ দুটি ঐশী বিধান	৯১
◈ সবকিছুই যথাসময়ে হয়	৯২
◈ ইসলাম : নিজ ভূমিতেই আগন্তুক	৯৫

◈ মুসলিম যুবকদের দৃষ্টিতে রাজনৈতিক পরিস্থিতি ১০১
◈ ইসলামি দাওয়াতের স্বাধীনতায় অবৈধ হস্তক্ষেপ ১০৪
◈ সহিংসতা ও জুলুম-নির্যাতনের মাধ্যমে চরমপন্থা নির্মূল ১০৯
চরমপন্থার প্রতিকার ১২২
◈ সমাজের করণীয় ১১৩
◈ আল্লাহর বিধানের দিকে ফেরা ১১৫
◈ যুবকদের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব ও পিতৃত্বের অনুভূতির সঞ্চার ১১৬
◈ চরমপন্থা প্রতিকারে চরমপন্থা অবলম্বন না করা ১১৮
◈ জানালা খুলে স্বাধীনতার বাতাস ঢুকতে দিন ১২১
◈ কেউ কাফির বললে, প্রত্যুত্তরে তাকে কাফির না বলা ১২৩
◈ মুসলিম তরুণদের কর্তব্য ১২৫
◈ ইসলামে আইনব্যবস্থার বিভিন্নতা ও ইখতিলাফের আদব ১২৯
◈ মূল্যবোধ ও কর্মের স্তর ১৩৯
◈ হারাম কাজসমূহের স্তর ১৪২
◈ মানুষের স্তর ১৪৪
◈ অন্যের সক্ষমতা, সীমাবদ্ধতা ও পরিস্থিতি মূল্যায়ন ১৪৮
◈ আল্লাহর সৃষ্টির নেজাম বোঝা ১৫৪
বিজয়ের নিয়ম ও শর্ত সম্পর্কিত কথোপকথন ১৫৯

মুসলিম যুবকদের প্রতি উপদেশ ১৬৪
◈ মুসলিম যুবকদের সঙ্গে আলোচনা ১৬৫
- বিশেষায়িত ব্যক্তিদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন ১৬৫
- মধ্যমপন্থি ও মুত্তাকিদের কাছ থেকে পরামর্শ গ্রহণ ১৭০
- সহজ করুন, কঠিন করবেন না ১৭২
- দাওয়াত ও কথাবার্তায় উত্তম আচরণ অবলম্বন ১৭৯
- সাধারণ মানুষের সঙ্গে মিশে যাওয়া ১৮১
- অপর মুসলমানের ব্যাপারে সুধারণা পোষণ করা ১৮৬

বাড়াবাড়ি : অভিযোগ ও বাস্তবতা

পণ্ডিতগণ বলে গেছেন, কোনো বিষয়ে পরিপূর্ণ ধারণা রাখা ছাড়া সে বিষয়ে স্বাধীন কোনো মন্তব্য করা ঠিক নয়। কারণ, অজানা বিষয়ে মন্তব্য করলে তা ভুল হয়। আর এ কারণেই 'ধর্মীয় বিষয়ে বাড়াবাড়ি' ব্যাপারটির প্রশংসা কিংবা নিন্দা করার আগে প্রথমে আমাদের জানতে হবে, এটি আসলে কী। আর এ কাজের জন্য প্রথমে আমাদের এর বাস্তবতা ও কিছু স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে জানতে হবে। আক্ষরিক অর্থে বাড়াবাড়ি বা চরমপন্থা বলতে বোঝায়, মূল কেন্দ্র থেকে সরে গিয়ে একেবারে সীমানায় অবস্থান করা। আর ধর্মীয় বিষয়ে বাড়াবাড়ি হচ্ছে, ধর্মীয় চিন্তাভাবনা ও আচার-আচরণের মূল কেন্দ্র থেকে সরে গিয়ে অনেক দূরে অবস্থান করা। আর এ কারণেই চরমপন্থার অনেকগুলো নেতিবাচক ফলাফলের মধ্যে অন্যতম হচ্ছে, এর অনুসারীরা সর্বদাই বিপদ ও অনিরাপত্তার মধ্যে থাকে।

কোনো এক আরব কবি বলেছেন—'প্রথমে তারা ছিল সুরক্ষিত কেন্দ্রবিন্দুতে; পরবর্তীকালে তারা আনাচে-কানাচে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে পড়ল, ফলে বিপর্যস্ত হলো।'

মধ্যমপন্থার আহ্বান এবং চরমপন্থার বিরুদ্ধে সতর্কবাণী

ঈমান, ইবাদত, মুয়ামালাত, মুআশারাত—সবকিছুতে ইসলাম মধ্যমপন্থা ও ভারসাম্য অবলম্বন করার কথা বলেছে। আর এটিই হচ্ছে সিরাতে মুস্তাকিম— যার প্রতি আল্লাহ তায়ালা আমাদের আহ্বান করেছেন। মধ্যমপন্থা ও ভারসাম্য অবলম্বন করা ইসলাম ও মুসলিম জাতির একটি স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য। আল্লাহ তায়ালা বলেন—

وَكَذٰلِكَ جَعَلْنٰكُمْ اُمَّةً وَّسَطًا لِّتَكُوْنُوْا شُهَدَآءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُوْنَ الرَّسُوْلُ عَلَيْكُمْ شَهِيْدًا-

'আর এভাবেই আমি তোমাদের মধ্যমপন্থি উম্মত বানিয়েছি, যাতে তোমরা মানুষের ওপর সাক্ষী হও এবং রাসূল সাক্ষী হন তোমাদের ওপর।'[৩]

মুসলিম উম্মাহ হচ্ছে মধ্যমপন্থি ন্যায়পরায়ণ জাতি, যারা সিরাতে মুস্তাকিম থেকে বিচ্যুত যেকোনো পথের বিরুদ্ধে অকুণ্ঠচিত্তে সাক্ষ্য দেয়। ইসলামে এমন কিছু পরিভাষা রয়েছে, যাতে মধ্যমপন্থা অবলম্বনের এবং সব ধরনের চরমপন্থা প্রত্যাখ্যান ও পরিহারের আহ্বান জানানো হয়েছে। যেমন : (গুলু) বাড়াবাড়ি, তানাতু (উগ্রতা) ও তাশদিদ (কঠোরতা)। এসব পরিভাষার প্রতি লক্ষ করলে বোঝা যায়, ইসলাম গুলু তথা বাড়াবাড়ির বিরুদ্ধে খুব শক্ত অবস্থান নিয়েছে। আসুন, এ সম্পর্কে নবিজির একটি হাদিস দেখে আসি। তিনি বলেছেন— 'তোমরা ধর্মে বাড়াবাড়ি করো না। কারণ, তোমাদের পূর্ববর্তী জাতি বাড়াবাড়ির কারণে ধ্বংস হয়ে গেছে।' এই হাদিসে পূর্ববর্তী জাতি বলতে ইহুদি-খ্রিষ্টানদের বোঝানো হয়েছে। আহলে কিতাব বলতে বিশেষত খ্রিষ্টানদেরই বোঝানো হয়। আল্লাহ তায়ালা আহলে কিতাবদের সম্বোধন করে বলেছেন—

---

[৩] সূরা বাকারা : ১৪৩

قُلْ يٰٓاَهْلَ الْكِتٰبِ لَا تَغْلُوْا فِيْ دِيْنِكُمْ غَيْرَ الْحَقِّ وَ لَا تَتَّبِعُوْٓا اَهْوَآءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوْا مِنْ قَبْلُ وَ اَضَلُّوْا كَثِيْرًا وَّ ضَلُّوْا عَنْ سَوَآءِ السَّبِيْلِ-

'তুমি বলো, হে আহলে কিতাব! তোমরা নিজেদের ধর্মে অন্যায়ভাবে সীমালঙ্ঘন করো না এবং ওই সম্প্রদায়ের (ভিত্তিহীন) কল্পনার ওপর চলো না, যারা অতীতে নিজেরাও ভ্রান্তিতে পতিত হয়েছে এবং অন্যদের ভ্রান্তিতে নিক্ষেপ করেছে। বস্তুত তারা সরল পথ থেকে দূরে সরে পড়েছিল।'[৪]

এজন্য মুসলমানদের সতর্ক করা হয়েছে, তারা যেন তাদের পদাঙ্ক অনুসরণ না করে। পূর্ববর্তীদের ভুল থেকে যে শিখতে পারে, তার জীবন আরও স্বচ্ছন্দ হয়। উপরিউক্ত হাদিস দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে, আমাদের এই বিষয়ে সতর্ক করা যে, প্রথমে বাড়াবাড়ি বিষয়টা আমাদের কাছে খুব বেশি গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে হয় না বা এটিকে আমরা খুব একটা গুরুত্বের চোখে দেখি না। তারপরও এটি যদি চলতে থাকে, তাহলে একসময় এটি আমাদের অজান্তেই ফিতনায় রূপ নেবে।

বিদায় হজের সময় মুজদালিফায় পৌঁছে নবিজি আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.)-কে কিছু পাথর জড়ো করতে বলেন। ইবনে আব্বাস (রা.) কিছু ছোটো ছোটো পাথর নিয়ে এলেন। নবিজি সম্মতিসূচকভাবে বললেন—'হ্যাঁ, এ রকম ছোটো ছোটো পাথর দিয়েই শয়তানকে আঘাত করতে হবে। ধর্মে বাড়াবাড়ি বিষয়ে তোমরা সতর্ক থাকবে।' এ থেকে নবিজি বোঝাতে চাচ্ছেন—যারা ধারণা করেন, শয়তানকে উদ্দেশ্য করে বড়ো বড়ো পাথর মারাটা উত্তম, তারা মূলত অত্যুৎসাহী ও ভুলের মধ্যে আছে। আর এভাবেই ধীরে ধীরে তাদের জীবনে চরমপন্থা জায়গা করে নেয়।

ইমাম ইবনে তাইমিয়া (রহ.) বলেন—'বাড়াবাড়ি বিষয়ে ইসলামে যে সতর্কবাণী উচ্চারণ করা হয়েছে, তা ঈমান, ইবাদত, লেনদেন সবকিছুর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। আর ধর্মীয় বিষয়ে বাড়াবাড়ির ক্ষেত্রে যেহেতু খ্রিষ্টানরাই এগিয়ে, এজন্য আল্লাহ তায়ালা বিশেষ করে তাদের সতর্ক করে আয়াত নাজিল করেছেন—'হে আহলে কিতাব! তোমরা স্বীয় ধর্মে সীমা অতিক্রম করো না।'[৫] রাসূল (সা.) বলেছেন— 'যারা ধর্মীয় বিষয়ে অধিক পণ্ডিতি করে, আর ছোটোখাটো সমালোচনা করতেও ছাড়ে না, তারা ধ্বংস হবে।' তিনি এ কথা দুবার বলেছেন।

ইমাম নববি (রহ.) বলেন—'এ হাদিসে তাদের কথা বলা হয়েছে, যারা ধর্মীয় বিষয়ে খুব গভীরে গিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি, কথাবার্তা ও আমলে চরমপন্থা অবলম্বন করে। আরেক ব্যাখ্যায় পাওয়া যায়, এ হাদিস এবং (এই বইয়ের) ঠিক এর পূর্বের হাদিসে ধর্মীয় বিষয়ে যারা বাড়াবাড়ি ও চরমপন্থা অবলম্বন করে, তাদের দুনিয়াবি ও আখিরাতের জীবনের ধ্বংসাত্মক পরিণতির কথা বলা হয়েছে। অন্যকথায়, এটি মৃত্যুর চেয়েও অধিক ভয়ানক। এত কিছুর পরেও ধর্মীয় বিষয়ে বাড়াবাড়ি না করার জন্য আমাদের আর কত বড়ো সতর্কবাণী প্রয়োজন?

আবু ইয়ালা (রহ.) আনাস বিন মালেক (রা.) থেকে একটি হাদিস তাঁর মুসনাদে উদ্ধৃত করেছেন। তিনি বলেন, রাসূল (সা.) বলেছেন—'তোমরা নিজেদের ওপর খুব বেশি কঠোর হয়ো না;

---

[৪] সূরা মায়েদা : ৭৭

[৫] সূরা নিসা : ১৭১

অন্যথায় আল্লাহ তায়ালা তোমাদের ওপর কঠোর হবেন। তোমরা তো দেখতেই পাচ্ছ বাড়াবাড়ি করতে গিয়ে আশ্রম ও মঠবাসীদের কী অবস্থা হয়েছে। আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কুরআনে বলেন—

وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ-

'আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের আশায় তারাই বৈরাগ্যবাদের প্রবর্তন করেছিল। এটা আমি তাদের ওপর লিপিবদ্ধ করে দিইনি।'[৬]

ধর্মীয় চরমপন্থা, ইবাদতের ক্ষেত্রে মাত্রাতিরিক্ত বাড়াবাড়ি ও মধ্যমপন্থা অতিক্রম করে বাড়াবাড়ির এমন পর্যায়ে চলে যাওয়া—যাতে তা সন্ন্যাসে পরিণত হয়, এ সবকিছুই নবিজি কঠোরভাবে নিষেধ করেছেন। তিনি নিজেও আধ্যাত্মিক ও বৈষয়িক; দুনিয়াবি ও আখিরাতের জীবন; বান্দার হক ও স্রষ্টার হক—এগুলোর মধ্যে চমৎকার ভারসাম্য বজায় রেখে চলতেন।

ইসলাম তার অনুসারীদের জন্য এমন সব ইবাদতের বিধান দিয়েছে, যাতে করে আত্মা পরিশোধিত হয়। আর মানুষ আধ্যাত্মিক ও বৈষয়িক উভয় দিক থেকেই উৎকর্ষতা লাভ করতে পারে। ইসলামের প্রতিটি বিধান উম্মাহর সামগ্রিক কল্যাণ, ভ্রাতৃত্ব ও সংহতি নিশ্চিত করে। বৈশ্বিক উন্নতি ও অগ্রগতির জন্য মানবীয় দায়িত্বসমূহকে ইসলাম মোটেও অস্বীকার করে না। উদাহরণস্বরূপ, সালাত, জাকাত, রোজা ও হজ; এগুলো একদিকে যেমন ব্যক্তিগত ইবাদত, তেমনই সাম্প্রদায়িকও (সামগ্রিক)। ইসলাম কোনোভাবেই মুসলমানদের জীবন ও সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেয় না। বরং ইসলাম জীবন ও সমাজের সঙ্গে একজন মুসলমানের সম্পর্ককে আরও শক্তিশালী করে। এ কারণেই ইসলামে বৈরাগ্যবাদ নেই। কেননা, বৈরাগ্যবাদের ফলে ব্যক্তি সমাজ ও জীবন থেকে নিজেকে আলাদা করে ফেলে। বৈরাগ্যবাদ অনুসারীদের কাছে জীবন ও সমাজ উন্নয়ন, জীবনকে উপভোগ করা এসবের কোনো মূল্য নেই। ইসলাম গোটা পৃথিবীকে ইবাদতের স্থান বলে মনে করে। যতক্ষণ পর্যন্ত একজন মুমিন দুনিয়াতে বেঁচে থাকার মূল উদ্দেশ্য ঠিক রেখে আল্লাহর দেখানো পথে জীবনযাপন করবে, সে প্রতি মুহূর্তে ইবাদত ও আত্মিক জিহাদের সওয়াব পেতে থাকবে।

ইসলাম বৈষয়িক বিষয়াদি বিসর্জন দিয়ে শুধু আধ্যাত্মিকতার কথা বলে না। আবার শরীরকে কষ্ট দিয়ে শুধু আত্মার পরিশুদ্ধির কথাও বলে না। ইসলাম এগুলোর মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখার কথা বলে—'হে আমাদের রব! আমাদের দুনিয়াতে কল্যাণ দিন এবং আখিরাতেও কল্যাণ দিন।'[৭] হাদিসেও রাসূল (সা.) আমাদের এরূপ দুআ শিখিয়েছেন—

اللَّهُمَّ أَصْلِحْ لِي دِينِيَ الَّذِي هُوَ عِصْمَةُ أَمْرِي وَأَصْلِحْ لِي دُنْيَايَ الَّتِي فِيهَا مَعَاشِي وَأَصْلِحْ لِي آخِرَتِي الَّتِي فِيهَا مَعَادِي وَاجْعَلِ الْحَيَاةَ زِيَادَةً لِي فِي كُلِّ خَيْرٍ وَاجْعَلِ الْمَوْتَ رَاحَةً لِي مِنْ كُلِّ شَرٍّ. «

'হে আল্লাহ! আমার সকল কাজকর্মের হেফাজতকারী হিসেবে ধর্মকে সঠিকরূপে উপস্থাপিত করুন। আমার যাবতীয় কর্মকাণ্ডকে পরিশুদ্ধ করুন, যেখানে আমি জীবন নির্বাহ করি। আমার পরকালীন জীবনকেও পবিত্র করুন এবং সার্বিক কল্যাণের লক্ষ্যে আমার জীবনকে

[৬] সূরা হাদিদ : ২৭

[৭] সূরা বাকারা : ২০১

প্রাচুর্যের উৎস বানিয়ে দিন। সকল অপকর্ম থেকে আমাকে রক্ষা করে আমার মৃত্যুকে শান্তির উৎসে পরিণত করুন।'[৮]

নবিজি আরও বলেছেন—'তোমার ওপরে তোমার শরীরের হক আছে।' আল্লাহ তায়ালা তাঁর বান্দাকে ভোগবিলাসের যেসব উপকরণ দান করেছেন, সেগুলো থেকে স্বেচ্ছায় বিরত থাকার ব্যাপারে পবিত্র কুরআনেও নিষেধাজ্ঞা এসেছে। পবিত্র কুরআনে মক্কায় অবতীর্ণ একটি আয়াত আছে। আল্লাহ তায়ালা বলেন—

يٰبَنِيْٓ اٰدَمَ خُذُوْا زِيْنَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَّ كُلُوْا وَ اشْرَبُوْا وَ لَا تُسْرِفُوْا ۚ اِنَّهٗ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِيْنَ- قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِيْنَةَ اللّٰهِ الَّتِيْٓ اَخْرَجَ لِعِبَادِهٖ وَ الطَّيِّبٰتِ مِنَ الرِّزْقِ

'হে আদমসন্তান! প্রত্যেক সালাতের সময় সুন্দর পোশাক-পরিচ্ছদ গ্রহণ করো, আর খাও এবং পান করো, তবে অপব্যয় করবে না! নিশ্চয়ই আল্লাহ অপব্যয়কারীদের ভালোবাসেন না। তুমি জিজ্ঞেস করো, আল্লাহ তাঁর বান্দাদের জন্য যেসব শোভনীয় বস্তু ও পবিত্র জীবিকা সৃষ্টি করেছেন, তা কে নিষিদ্ধ করেছে?'[৯]

মক্কায় অবতীর্ণ আরেকটি আয়াতে আল্লাহ তায়ালা মুমিনদের একইভাবে সম্বোধন করে বলছেন—

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تُحَرِّمُوْا طَيِّبٰتِ مَآ اَحَلَّ اللّٰهُ لَكُمْ وَ لَا تَعْتَدُوْا ؕ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِيْنَ- وَ كُلُوْا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللّٰهُ حَلٰلًا طَيِّبًا ۪ وَّ اتَّقُوا اللّٰهَ الَّذِيْٓ اَنْتُمْ بِهٖ مُؤْمِنُوْنَ-

'হে মুমিনগণ! আল্লাহ যেসব পবিত্র বস্তু তোমাদের জন্য হালাল করেছেন, তোমরা তা হারাম করো না এবং তোমরা সীমালঙ্ঘন করো না। নিশ্চয় আল্লাহ সীমালঙ্ঘনকারীদের পছন্দ করেন না। আর আহার করো আল্লাহ যা তোমাদের রিজিক দিয়েছেনও তা থেকে হালাল ও পবিত্র বস্তু। আর তাকওয়া অবলম্বন করো আল্লাহর, যার প্রতি তোমরা ঈমান এনেছ।'[১০]

এসব আয়াত থেকে বোঝা যায়, মুমিনগণ তাদের জীবনে হালালভাবে অবশ্যই ভোগবিলাসিতার উপকরণ উপভোগ করতে পারবে। একই সঙ্গে ধর্মীয় বিষয়ে সব ধরনের বাড়াবাড়ি এড়িয়ে চলবে। বর্ণিত আছে, এসব আয়াত নাজিল হওয়ার পূর্বে নবিজির কিছু সাহাবি নিজেদের পুরুষত্ব হনন করে সন্ন্যাসীর মতো ঘুরে বেড়ানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, এক লোক নবিজির কাছে এসে বললেন—'হে আল্লাহর রাসূল! যখনই আমি মাংস খাই, আমার ভেতরে যৌন প্রবৃত্তি মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে। এ কারণে আমি মাংস খাওয়া থেকে বিরত থাকার সিদ্ধান্ত নিয়েছি।' সাহাবির কথার উত্তরে আল্লাহ তায়ালা উক্ত আয়াত নাজিল করেন।

সহিহ বুখারি ও মুসলিমে এসেছে, আয়িশা (রা.) বর্ণনা করেন—এক দল লোক নবিপত্নীদের কাছে এসে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর ইবাদত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন। এ ব্যাপারে অবহিত হওয়ার পর তাঁরা তাঁদের ইবাদত-বন্দেগিকে অপর্যাপ্ত বিবেচনা করে তাঁদের একজন বললেন—'আমি

[৮] সহিহ মুসলিম : ৭০৭৮

[৯] সূরা আরাফ : ৩১-৩২

[১০] সূরা মায়েদা : ৮৭-৮৮

সর্বদা সারা রাত নামাজ পড়ব।' আরেকজন বললেন—'আমি সারা বছর রোজা রাখব এবং কখনো ভাঙব না।' এ সময় নবিজি তাঁদের কাছে এসে বললেন—'আল্লাহর শপথ! আল্লাহর প্রতি আনুগত্য আমারই সবচেয়ে বেশি এবং আমিই তাঁকে বেশি ভয় করি তোমাদের চেয়ে। আমি রোজা রাখি এবং ভাঙিও। আমি ঘুমাই এবং নারীকে বিয়ে করি। সুতরাং যে আমার সুন্নতকে অনুসরণ করে না, সে আমার অনুসারীদের অন্তর্ভুক্ত নয়।'

সুন্নাহ বলতে ইসলাম এবং এর বিধিবিধানসমূহ বাস্তবায়নে নববিপন্থাকে বোঝায়। অর্থাৎ তিনি যেভাবে তাঁর রবের প্রতি দায়িত্ব পালন করেছেন, তাঁর নিজের প্রতি, নিজের পরিবারের প্রতি এবং তাঁর চারপাশের মানুষদের প্রতি যে ভারসাম্যপূর্ণ আচরণ তিনি করতেন, তার সবটাই তাঁর সুন্নাহর অন্তর্ভুক্ত।

ধর্মীয় চরমপন্থার বিচ্যুতি এবং এর ভয়ানক পরিণতি

চরমপন্থার সঙ্গে এর ভয়ানক পরিণতি স্বভাবজাতভাবেই জড়িত। তাই এ সম্পর্কে প্রয়োজনীয় সতর্কবাণী উচ্চারণ করা জরুরি। এর একটি প্রধান বিচ্যুতি হচ্ছে, কোনো সুস্থ-স্বাভাবিক মানবপ্রকৃতি এটিকে মেনে নিতে পারে না। যদিও কতিপয় মানুষ অল্প সময়ের জন্য চরমপন্থা বা বাড়াবাড়ি সহ্য করতে পারে, কিন্তু অধিকাংশ মানুষেরই এই ক্ষমতা থাকে না। আল্লাহ তায়ালার সকল বিধান সামগ্রিকভাবে সবার জন্য প্রযোজ্য। তিনি নির্দিষ্ট এমন কোনো জাতি-গোষ্ঠীর জন্য বিধান দেননি, যাদের বিশেষ সহ্যক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। আর এজন্য নবিজি একবার তাঁর সাহাবি মুয়াজের সঙ্গে রেগে গিয়েছিলেন। কারণ, একদিন সালাতে ইমামতি করার সময় তিনি এত দীর্ঘ সূরা তিলাওয়াত করলেন, যা অনেকের জন্য কষ্টকর হয়ে যায়। সেখান থেকে একজন লোক নবিজির কাছে গিয়ে এ ব্যাপারে অভিযোগ জানায়। নবিজি মুয়াজ (রা.)-কে ডেকে বললেন— 'হে মুয়াজ! তুমি কি মানুষকে কষ্ট দিচ্ছ?' তিনি এ কথা তিনবার বললেন।

আরেকবার তিনি একজন ইমামকে অত্যন্ত কড়া ভাষায় বলেছিলেন— 'তোমাদের মধ্যে কেউ কেউ ভালো কাজের প্রতি মানুষের বিতৃষ্ণা সৃষ্টি করে। তাই তোমরা যখনই সালাতের ইমামতি করবে, তখন তা সংক্ষিপ্ত করবে। কারণ, মুসল্লিদের মধ্যে দুর্বল, বৃদ্ধ ও কর্মব্যস্ত লোক থাকে।'

নবিজি মুয়াজ ও আবু মুসা (রা.)-কে ইয়েমেনের উদ্দেশে প্রেরণের সময় তাঁদের একটি উপদেশ দেন। তা হচ্ছে—'মানুষের জন্য ধর্মীয় বিষয়গুলো সহজ করে উপস্থাপন করবে; কঠিন করবে না। সবাইকে সুসংবাদ দেবে; দুঃসংবাদ দিয়ে নিরাশ করবে না। একে অপরকে মেনে চলবে; বিভেদ সৃষ্টি করবে না।'

এ ব্যাপারে গুরুত্ব আরোপ করে উমর ইবনে খাত্তাব (রা.) বলেন—'সালাতের ইমামতি দীর্ঘ করে বান্দার কাছে তার কাজকে এবং আল্লাহকে ঘৃণার পাত্রে পরিণত করো না।'

বাড়াবাড়ির আরেকটি বিচ্যুতি হচ্ছে, এটি দীর্ঘস্থায়ী হয় না। মানুষকে খুব সীমিত সহ্যক্ষমতা দিয়ে সৃষ্টি করা হয়েছে। ফলে সে অল্পতেই বিরক্ত হয়। তাই মানুষের পক্ষে দীর্ঘ সময় ধরে বাড়াবাড়ি সহ্য করা সম্ভব হয় না। হতে পারে সাময়িকের জন্য সে বাড়াবাড়ি মেনে নেবে; কিন্তু শীঘ্রই সে এর প্রতি তার শারীরিক ও মানসিক রুচি হারিয়ে ফেলবে। একপর্যায়ে এমন হবে, সে

আগে যতটুকু সহ্য করতে পারত, এখন তাও পারছে না। এখানে সবচেয়ে বড়ো ভয়ের বিষয় যেটি, তা হচ্ছে—বাড়াবাড়ির প্রতি বিরক্ত হয়ে একপর্যায়ে সে সম্পূর্ণরূপে ছেড়ে দেয়, যেটি আরেকটি সমস্যা।

প্রায়ই আমার এমন সব লোকের সাথে দেখা হতো, যারা ধর্মীয় বিষয়াদিতে অত্যন্ত কঠোর ও চরমপন্থি। কিছুদিন পর তাদের সাথে যোগাযোগ করে কিংবা তাদের ব্যাপারে খবর নিয়ে জানা যায়, তারা হয়তো সবকিছু ছেড়ে দিয়েছে অথবা অন্তত বাড়াবাড়ি করতে গিয়ে যেটুকু আগানো উচিত ছিল, সেটুকু আগাতে পারেনি। এ বিষয়ে ইঙ্গিত করেই হাদিসে এসেছে—'যে (হঠকারী তাড়াহুড়োপ্রবণ) লোক নির্দিষ্ট দূরত্ব অতিক্রম করতে পারে না, সে এমনকি তার বাহনের পিঠটাকেও ঠিক রাখতে পারে না।'

এ ব্যাপারে আরও একটি চমৎকার হাদিস রয়েছে—'তোমরা সেইসব সৎকর্মে প্রবৃত্ত হও, যা সহজে সম্পন্ন করা যায়। কেননা, আল্লাহ তায়ালা পুরস্কারদানে ক্লান্ত হন না, যতক্ষণ না তুমি নেক আমলে ক্লান্ত ও অবসন্ন হও। আর আল্লাহর কাছে সেই আমলই সবচেয়ে প্রিয়, যা নিয়মিত সম্পাদন করা হয়, তা যতই ছোটো হোক না কেন।'

ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন—নবিজির একজন খাদেম দিনে রোজা রাখতেন, আর সারা রাত সালাত আদায় করতেন। নবিজিকে এ বিষয়ে জানানো হলে তিনি বললেন—'প্রতিটি কাজের একটি শীর্ষবিন্দু থাকে এবং সেটিকে আবশ্যক বানিয়ে ফেলাটা বাড়াবাড়ি। যে তার স্বাভাবিক সরল জীবনে আমার সুন্নাহকে অনুসরণ করে, সে সঠিক পথে আছে। আর যে শৈথিল্য কিংবা বাড়াবাড়ির কারণে অন্যের পথনির্দেশ অনুসরণ করে, সে ভুল করল এবং সরল পথ থেকে সরে গেল।'

সাহাবি আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা.) বলেন—ইবাদত-বন্দেগিতে লিপ্ত থাকতে থাকতে ক্লান্ত ব্যক্তিদের সম্পর্কে রাসূল (সা.)-কে অবহিত করা হলে তিনি বললেন—'এটা হচ্ছে ইসলামের কঠোর অনুশীলন এবং আমলের সর্বোচ্চ পর্যায়। প্রতিটি গোঁড়া ক্রিয়া-কলাপের একটি শীর্ষ পর্যায় থাকে এবং সেইসাথে থাকে অনিবার্য শৈথিল্য। যার সহজ-সরল আমল কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে নিষ্পন্ন হয়, সে-ই সঠিক পথের ওপর কায়েম থাকে। আর যার অবসন্নতা অবাধ্যতায় পর্যবসিত হবে, তার ধ্বংস অবশ্যম্ভাবী।'

এজন্য প্রতিটি মুসলমানের উচিত ইবাদতের ক্ষেত্রে খুব বেশি বাড়াবাড়ি না করা, যাতে অবসন্নতা পেয়ে বসে। ফলে একপর্যায়ে দেখা যায়, ওই ইবাদত একেবারেই ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। এজন্য প্রত্যেকেরই উচিত ইবাদত ও আমলের ক্ষেত্রে মধ্যমপন্থা অবলম্বন করা। এ ব্যাপারে নবিজি বলেছেন—'ধর্ম খুব সহজ। আর যে নিজের ওপর অতিরিক্ত বোঝা চাপিয়ে নেয়, সে তা শেষ পর্যন্ত ধরে রাখতে পারে না। সঠিক পথে চলো; বাড়াবাড়ি বা ছাড়াছাড়ি কোনোটিতেই লিপ্ত হয়ো না। পূর্ণতার নিকটবর্তী হওয়ার চেষ্টা করো এবং তোমার সৎকর্মের পুরস্কার লাভের জন্য সুসময়ের অপেক্ষা করো।'

চরমপন্থার তৃতীয় বিচ্যুতি হচ্ছে, কোনো বিষয়ে চরমপন্থা অবলম্বন করা হলে অন্য আরেকটি বিষয়ের প্রতি দায়িত্বে অবহেলা করা হয়। এজন্যই কোনো এক মনীষী বলেছেন—'প্রতিটি বাড়াবাড়ি কোনো না কোনোভাবে ছাড়াছাড়ির জন্ম দেয়।'